পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

পদ্মানদীর মাঝি : প্রসঙ্গ কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯টি উপন্যাসের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও জনপ্রিয় উপন্যাসটির নাম *পদ্মানদীর মাঝি*। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর উপন্যাসটি একাধিক বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার গৌরব *পদ্মানদীর মাঝির*। ভারতের একাধিক প্রাদেশিক ভাষাসহ ইংরেজি, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, রুশ, লিথুয়ানিয়ান, নরওয়েজিয়ান ও সুইডিশ ভাষায় উপন্যাসটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে বিস্তীর্ণ পদ্মাতীর সংলগ্ন কেতুপুর ও পার্শ্ববর্তী কতিপয় গ্রামের জেলেদের জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে নিপুণ মুন্সিয়ানায়। নগর জীবনের সামান্য ছিটেফোঁটাও নেই এ উপন্যাসে। হতদরিদ্র জেলেদের জীবন সংগ্রাম উপস্থাপিত হয়েছে *পদ্মানদীর মাঝিতে*। গল্পের পটভূমি বিবেচনা করলে বলা যায়, *পদ্মানদীর মাঝি* একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। অলঙ্কার শাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী এ উপন্যাসের আঙ্গিক, বুননশৈলী, চরিত্রের ভাষা, জীবনাচার, জীবনচর্চা সবই আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন–*...উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে এ সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণি অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, এর সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা-নির্দেশ।'*

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর নাম উচ্চারণ করে নিই–*জননী*, *দিবারাত্রির কাব্য*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুল নাচের ইতিকথা*, *শহরতলী*, *চতুষ্কোণ*, *জীবন্ত*, *সোনার চেয়ে দামী*, *ইতিকথার পরের কথা* ইত্যাদি। এ ছাড়া লেখেন *অতসী মামী*, *প্রাগৈতিহাসিক*, *মিহি ও মোটা কাহিনী*, *আজ কাল পরশুর গল্প*, *ছোটো বকুলপুরের যাত্রী*, *ফেরিওয়ালা* ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি পাঠ করতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই পাঠকের অনুসন্ধিৎসা থাকবে বাঙালির জীবনাচারে খাদ্য তালিকার অন্যতম আকর্ষণ ইলিশ; কারণ ইলিশের প্রসঙ্গ এলেই আসে পদ্মার ইলিশ। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের কৈবর্তপল্লির মাঝিদের জীবিকার প্রধান উৎস ইলিশ শিকার। উপন্যাসে ইলিশ শিকারের প্রসঙ্গ অবশ্যই আছে; আছে ইলিশ শিকারের যন্ত্রণা, বিপণনের সঙ্কট, ইলিশের দাম নিয়ে মুৎসুদ্দি শ্রেণির প্রতারণা, মূল্যবোধের স্খলন কোনো কিছুই বাদ যায়নি উপন্যাসে। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের টানাপড়েন, শরীরী আকর্ষণ এবং নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে সাম্যবাদী জীবনাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের হাতছানির কাছে পরাজিত হয়ে যায়। কাহিনির নায়ক, কুবের, যে পদ্মা নদীর দক্ষ মাঝি, যাকে আমরা দেখি প্রবল ঝড়েও লড়াই করে ফিরে আসতে; কুবেরের চিররুগ্ন প্রতিবন্ধী স্ত্রী মালা, যে তার তিন সন্তানের জননী; সেই স্ত্রী, সন্তান এবং সংসারের প্রতি কুবেরের দায়বদ্ধতার পাশাপাশি মালার ছোটোবোন কপিলার প্রতি তাকে আকৃষ্ট হতে দেখি উপন্যাসে; এবং শেষ পর্যন্ত কুবের যখন স্বপ্নের আহ্বানে ময়নাদ্বীপে নতুন পৃথিবী গড়ার জন্য যাত্রা করে, তখন কপিলা তার সঙ্গী হয়ে যায়। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র, যেমন–রাসু, শীতলবাবু, ধনঞ্জয়, পীতম মাঝি, গণেশ, আমিনুদ্দি এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের উপস্থিতিতে যে গল্প পল্লবিত হয়ে ওঠে, সবাইকে অলক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে বিস্ময়কর চরিত্র হোসেন মিয়া। হোসেন মিয়া পদ্মাতীরের মানুষ নয়। বহিরাগত হয়েও হোসেন পদ্মাতীরের দরিদ্র মানুষকে সহযোগিতা করে, তাদের বিপর্যয়ে পাশে দাঁড়ায়। হোসেন মিয়াকে শুধু বিস্ময়কর চরিত্র বললেই হয় না; হোসেন মিয়া বরং এ উপন্যাসে অসংলগ্ন এক অতিমানবিক চরিত্র। ঔপন্যাসিকের স্বপ্নের চরিত্রও বলা যায় তাকে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চক্রান্ত, সমবেদনা, দলাদলি, স্বার্থপরতা, প্রতিশোধ প্রবণতা এবং আবেগ, পদ্মানদীর মাঝিদের ইলিশের সম্পৃক্ততাকে কখনও গৌণ করে তোলে; প্রধান হয়ে ওঠে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের স্বপ্ন বাস্তবায়ন। ইলিশ যেন *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের নেপথ্যচারী চরিত্র, সামান্য সময়ের জন্য দৃশ্যমান হয়েও সর্বত্র বিরাজমান। আমরা যদি লক্ষ করি, দেখব, উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ইলিশ ধরার বর্ণনা দিয়ে; একটু পড়ে নিই–

বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সঞ্চালিত হয়। একসময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেল-স্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়। কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দু'জন লোক আছে, ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিন জনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে। আরও দু-মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

লেখকের পদ্মাতীরের কেতুপুরের মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্তি না থাকলেও আপন মেধা ও মনীষার যোগ্যতায়, অনায়াসে হোসেন মিয়া হয়ে ওঠা; নিজের স্বপ্নকেই হোসেন মিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নেওয়া; এখানেই কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশলতা।

সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে পদ্মাতীরের দরিদ্র মাঝিদের জীবনালেখ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি তার স্বপ্নের ময়নাদ্বীপের কথা নিপুণভাবে তুলে এনেছেন। আমার বিশ্বাস স্বপ্নের ময়নাদ্বীপ দীর্ঘদিন ধরে বাংলার অনুসন্ধানী পাঠককেও স্বপ্নপ্রবণ করে তুলছে।

পদ্মানদীর মাঝি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও একাধিক বিদেশি ভাষায় অনূদিত জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। এটি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের চতুর্থ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৩৪ সাল থেকে *পূর্বাশা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৯৩৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার পরে ভারতীয় উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত হওয়ার

গৌরব লাভ করে এই উপন্যাসটি। ভারতের একাধিক প্রাদেশিক ভাষাসহ ইংরেজি, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, রুশ, লিথুয়ানিয়ান, নরওয়েজিয়ান ও সুইডিশ ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদ প্রকশিত হয়। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে *পদ্মানদীর মাঝি* চলচ্চিত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের বিক্রমপুর-ফরিদপুর অঞ্চল। এই উপন্যাসের দেবীগঞ্জ ও আমিনবাড়ি পদ্মার তীরবর্তী গ্রাম। উপন্যাসে পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পদ্মার মাঝি ও জেলেদের বিশ্বস্ত জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে। পদ্মা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। এর ভাঙন প্রবণতা ও প্রলয়ংকরী স্বভাবের কারণে একে বলা হয় 'কীর্তিনাশা' বা রাক্ষুসী পদ্মা। এ নদীর তীরের নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। শহর থেকে দূরে এ নদী এলাকার কয়েকটি গ্রামের দীন-দরিদ্র জেলে ও মাঝিদের জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। জেলেপাড়ারর মাঝি ও জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, যা কিনা প্রকৃতিগতভাবে সেই জীবনধারায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা এখানে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাদের প্রতিটি দিন কাটে দীনহীন অসহায় আর ক্ষুধা-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই যেন তাদের জীবনের পরম আরাধ্য। এটুকু পেলেই তারা খুশি।

সব কটি চরিত্রই যেন এই উপন্যাসের পটভূমি এবং সমাজের বাসিন্দাদের অকৃত্রিম রূপায়ন। আশ্চর্য এবং অদ্ভুত শৈল্পিক সৌকর্য ও পরিমিততি দিয়ে লেখক অতি যত্নসহকারে চরিত্রগুলো গড়ে তুলেছেন। এরা এ সমাজের একেবারেই খাঁটি ও অকৃত্রিম চরিত্র। তারা একান্তভাবেই যেন এই সমাজের উপযুক্ত।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। কুবের এ উপন্যাসের নায়কও। সংসারের অভাব-দারিদ্র্য ও দুঃখ-বেদনাদগ্ধ কুবের এক দিকে যেমন তার সংসারের অভিভাবক, তেমনি সে চিরপঙ্গু মালার স্বামী, অন্য দিকে সে তার সন্তানদের স্নেহময় পিতা। শহর থেকে দূরে পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত অজগ্রাম কেতুপুরের সে বাসিন্দা। পদ্মা নদীর সে এক পাকা মাঝি। সে নদীতে তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মাছ ধরে, বিশেষত ইলিশ মাছ ধরে সে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে।

একেবারে নিম্নবিত্ত ও নিম্নতম পর্যায়ের মানুষ কুবের। সহজ সরল হওয়ায় তাকে অনেকেই ঠকায়। তার মাঝেও আছে স্বাভাবিক দোষগুণ ও কামনা-বাসনা। তাছাড়া তার আছে একটি রোমান্টিক মন। সে তার স্ত্রী মালার বোন কপিলার প্রতি আদিম আকর্ষণ অনুভব করে। এই কুবের একসময় ঘটি ও টাকা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটার ভয়ে হোসেন মিয়ার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে। এক অসংস্কৃত, আদিম ও নিষিদ্ধ ভালোবাসার প্রতি আকৃষ্ট কুবের কপিলাকে নিয়ে চিরকালের জন্য চলে যায় হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে। পেছনে রেখে যায় তার সমস্ত অতীত জীবন আর পঙ্গু, অসহায় মালা ও তার সন্তান সন্ততিদের।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের নায়িকা কপিলা। ব্যক্তিগত পরিচয়ে সে মালার বোন, সাংসারিক পরিচয়ে সে এক জনের স্ত্রী। মালার মত সে পঙ্গু নয়। পুরুষের হৃদয়ে আদিম আবেদন সৃষ্টিকারী কপিলা কুবেরের সঙ্গে যেন উদাসীনভাবে প্রেমের অভিনয় করে যায়। তার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে বাপের বাড়িতে চলে আসে। বন্যার সময় সে কিছুদিন থাকে কেতুপুরে কুবেরের বাড়িতে।

কপিলা চতুর, চপল ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এক যুবতি। তার আচরণের মধ্যে কিছুটা আদিম ও অসংস্কৃত মনেরও পরিচয় লক্ষণীয়। যা সমাজের চোখে অনেকটাই নিন্দনীয়। কপিলার সতিন মারা গেকে তার স্বামী তাকে আবার নিতে এলে কপিলা অনুগত স্ত্রীর মতো তার সঙ্গে আবার আকুর-টাকুর চলে যায়। এতে তার সংসার ও বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কুবের যখন চুরির দায় এড়াতে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে যেতে মনস্ত করে, তখন কপিলা তার অতীত জীবনের সবকিছু ফেলে সেই যাত্রায় কুবেরে চিরসাথী হয়।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের রহস্যময় অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রধান চরিত্র হোসেন মিয়া। নোয়াখালীর এই লোকটি বহুদর্শী ও বহু অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি। কেতুপুর এলাকায় প্রথমে তাকে দীনহীন ও কপর্দকশূন্য এক ব্যক্তিরূপে দেখা গিয়েছিল। নোয়াখালি সন্দ্বীপ থেকে সুদূর পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রের বুকে হোসেন মিয়া একটি দ্বীপের পত্তন নিয়েছিল। বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র মানুষদের নিয়ে নানা উপকারের মধ্য দিয়ে সে সেই এলাকা থেকে

লোকজন নিয়ে ময়নাদ্বীপে লোকবসতি গড়ে তুলেছিল। এই ময়না দ্বীপকে ঘিরেই হোসেন মিয়ার সব স্বপ্ন। সেখানে সে এমন একটা জনসমাজ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে দলমত ও ধর্মমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একটা মানিবীয় মূল্যবোধসসম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলবে। মনুষ্যত্ব ও মানবতাই হবে সে সমাজের প্রধান ভিত্তি।

কুবের, কপিলা ও হোসেন মিয়া ছাড়াও আরও কয়েকটি চরিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে। যেমন–রাসু, ধনঞ্জয়, পীতম মাঝি, মালা, গণেষ, আমিনুদ্দি, রসুল, ফাতেমা প্রভৃতি চরিত্র। এ সব চরিত্রাবলির সমন্বয়ে এ উপন্যাসটিতে একটি সার্থক সমাজচিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায়।

আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা: *পদ্মানদীর মাঝি* বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাস। অলঙ্কার শাস্ত্রে আঞ্চলিক উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সে অনুসারে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, এটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। উপন্যাসের আঙ্গিক গঠন, রচনাশৈলী, পাত্র-পাত্রীদের মুখে আরোপিত ভাষা, জীবনাচরণ, জীবনচর্চা এ সবই আঞ্চলিক উপন্যাসেরই পরিচয়বাহী। এ সকল কারণে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতার দাবিদার এবং এ উপন্যাসের জগৎ বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ এক অজানা বস্তু বলে মনে হয়। নানা কারণে উপন্যাসটি জনপ্রিয়তারর শীর্ষে আরোহণ করে। এই উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ সাহিত্য উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে লিখেছেন–এর একটি কারণ অবশ্য বিষয়ের অভিনবত্ব–পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কতকটা অসাধারণ জীবনযাত্রারও আকর্ষণী শক্তি। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত কথ্য ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ। কিন্তু উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে এ সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণি অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, এর সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব-প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা নির্দেশ।

জেলে অধ্যুষিত গ্রামের জীবনযাত্রাই *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। এখানকার সমস্ত কিছুই যেন পরিচালিত হয় প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে। পদ্মা নদীর তীরবর্তী কেতুপুর সংলগ্ন যে এলাকাটির মানুষের

জীবনচিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে বাইরের সম্পর্ক বিবর্জিত। এই আঞ্চলিক উপন্যাসটির সার্থকতা বিষয়ে সমালোচকের এই উক্তিও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ উপন্যাসটির কোথাও এই ধীবর পল্লির জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত নাই। এ উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন–অধিবাসীদের ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রীতি, সমবেদনা, চক্রান্ত, দলাদলি সমস্তই বাহিরের মধ্যস্ততা ছাড়া নিজ প্রকৃতি নির্ধারিত সঙ্কীর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে। একটি সুখপাঠ্য, সার্থক ও বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে এখানেই এর সার্থকতা।

ফরিদ আহমদ দুলাল

এক

বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেল-স্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনও নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে, ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনেরই বাড়ি কেতুপুর গ্রামে। আরও দু-মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশি বড়ো নয়। পেছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু-তিনজনে কোনোরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষসীমায় বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুইটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভেতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।